শরীয়াহ-শাসিত সমাজ

ওয়ায়েল হাল্লাক

??????????

আজকের আধুনিক যুগে সমাজে অধিকাংশ বিরোধ মেটানো হয় সরকারি আদালতের মাধ্যমে। আদালতের বাইরে সালিশ হলেও তা সাধারণত রাষ্ট্রের আইন ও আইনী কাঠামোর অধীনেই পরিচালিত হয়। ইংরেজিতে এই প্রক্রিয়াকে 'আর্বিট্রেশন' বলা হয়।

কিন্তু প্রাক-শিল্প যুগের সমাজে, বিশেষ করে প্রাক-আধুনিক ইসলামী সমাজে, পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। মানুষের পারস্পরিক বিরোধ মেটানোর ক্ষেত্রে সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ ছিল খুবই সীমিত। অর্থাৎ, বিরোধ নিষ্পত্তি তখন প্রধানত রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল না। সমাজ নিজেই তার বহু বিরোধ সামলে নিত। অন্যভাবে বললে, প্রাক-আধুনিক ইসলামী সমাজে বিরোধ মেটানোর জন্য সব সময় লিখিত আইন বা আনুষ্ঠানিক আদালতের আশ্রয় নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল না। এর বদলে সমাজে প্রচলিত অনানুষ্ঠানিক সালিশ ও বিচারপ্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। পরিবার, বংশ, মহল্লা বা স্থানীয় সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিরা বিরোধে মধ্যস্থতা করতেন।

এগুলো রাষ্ট্রীয় আদালত ছিল না। কিন্তু সামাজিকভাবে এসব প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা ও কার্যকারিতা ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা ও আইনী ব্যবহার যখন একসঙ্গে কাজ করেছে, তখন প্রায় সব জায়গাতেই একটি বিষয় লক্ষ করা যায়: এর সঙ্গে নৈতিকতা ও সামাজিক রীতিনীতি গভীরভাবে যুক্ত থাকে।

প্রাক-শিল্প যুগের ইসলামী সমাজে এই সম্পর্ক বিশেষভাবে স্পষ্ট ছিল। সেখানে বিরোধ মেটানোর সময় শুধু লিখিত নিয়ম দেখা হতো না। মানুষের নৈতিক দায়িত্ব, সামাজিক সম্পর্ক, স্থানীয় রীতি এবং পারস্পরিক মর্যাদাও বিবেচনায় নেওয়া হতো। এর বিপরীতে, আধুনিক পশ্চিমা রাষ্ট্র এবং বর্তমানে পশ্চিমা ধাঁচে গড়ে ওঠা বহু অ-পশ্চিমা অর্থাৎ আমাদের মত রাষ্ট্রের আইনী সংস্কৃতিতে নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ থেকে আইন-আদালতকে প্রায় পুরোপুরি আলাদা রাখা হয়। আধুনিক আইনী ব্যবস্থায় নৈতিকতা আইনের ভেতরের স্বাভাবিক উপাদান হিসেবে আর কাজ করে না। বরং আইন একটি স্বতন্ত্র ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

কাজেই নৈতিকতা, বিশেষ করে যে নৈতিকতা ধর্ম কর্তৃক আমরা পেয়ে থাকি, তা আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করত। মানুষ কেবল শাস্তির ভয়েই নিয়ম মানত না। ধর্মীয় দায়িত্ববোধ, সামাজিক সম্মান, পারিবারিক মর্যাদা এবং নিজের বিবেকও তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করত। এ কারণে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আধুনিক রাষ্ট্রের মতো সর্বত্র বলপ্রয়োগকারী বাহিনী বা কঠোর সরকারি নজরদারির প্রয়োজন হতো না। সমাজের নৈতিক কাঠামোই অনেকাংশে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করত।

কোনো আইনী ব্যবস্থাকে বুঝতে হলে শুধু আদালতের দিকে তাকানো যথেষ্ট নয়। বিরোধ নিষ্পত্তির একমাত্র ক্ষেত্র আদালত—এমন ধারণাও পুরোপুরি সঠিক নয়। একটি বিরোধ আদালতে যাওয়ার আগে কীভাবে মোকাবিলা করা হয়, দুই পক্ষের মধ্যে কী আলোচনা হয়, পরিবার বা সমাজ কীভাবে সমাধানের চেষ্টা করে—এসবও আইনী ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অনেক ক্ষেত্রে আদালতের বাইরের এই প্রক্রিয়াগুলোই বিরোধের প্রকৃত গতিপথ নির্ধারণ করে। আদালত তখন শেষ ধাপ হিসেবে আসে। তাই আইনী ব্যবস্থা বলতে শুধু বিচারক, আদালত ও লিখিত আইন বোঝালে তার বড় একটি অংশ অদৃশ্য থেকে যায়।

ঐতিহ্যবাহী ইসলামী সমাজের মতো ঘনিষ্ঠ ও সুসংগঠিত সামাজিক কাঠামোর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এসব সমাজে কোনো বিরোধ দেখা দিলে তা সঙ্গে সঙ্গে আদালতে নেওয়া হতো না। প্রথমে পরিবার, বংশ, গোত্র, মহল্লা বা স্থানীয় গোষ্ঠীর ভেতরে তা মেটানোর চেষ্টা করা হতো।

মালয় অঞ্চল (বর্তমান মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই) থেকে মরক্কো পর্যন্ত মুসলিম সমাজে আইনী প্রক্রিয়ার সূচনা প্রায়ই এভাবেই ঘটত। অর্থাৎ আইনের প্রথম কার্যকর ক্ষেত্র ছিল সমাজ নিজেই। মুসলিম আদালতও এসব সামাজিক গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ওপর নির্ভর করত। কারণ কোনো বিরোধকে শুধু একটি লিখিত দাবি হিসেবে দেখা হতো না। প্রতিটি বিরোধের পেছনে থাকত নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক, পারিবারিক বা গোত্রীয় অবস্থান, স্থানীয় রীতি, নৈতিক দায়িত্ব এবং পারস্পরিক প্রত্যাশা। এসব উপাদান বিবেচনায় না নিলে বিরোধের প্রকৃত অর্থ বোঝা সম্ভব ছিল না। এই কারণেই মুসলিম আদালতের পক্ষে সামাজিক ও নৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিচার করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

আদালতে যাওয়ার আগেই বিরোধ মেটানোর প্রধান ক্ষেত্র ছিল ছোট ছোট সামাজিক গোষ্ঠী। যে ঘটনাগুলো আদালতের কোন রকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিষ্পত্তি হত সেসব ক্ষেত্রেও এই গোষ্ঠীগুলো মূল ভূমিকা পালন করত। এসব গোষ্ঠীর সমন্বয়েই মূলত বৃহত্তর মুসলিম সমাজ গড়ে উঠেছিল। যৌথ পরিবার, বংশ ও গোত্র ছিল সামাজিক জীবনের প্রধান ভিত্তি। একজন ব্যক্তি শুধু স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে পরিচিত হতেন না; তিনি একই সঙ্গে একটি পরিবার, বংশ বা গোত্রের সদস্যও ছিলেন। যদি অন্য কোনো সামাজিক ব্যবস্থা বা বাহিরের শক্তি এসব সম্পর্ককে দুর্বল বা বিভক্ত করে, তবুও পরিবার ও বংশের গুরুত্ব পুরোপুরি নষ্ট হতো না। ব্যক্তির সামাজিক পরিচয় ও নিরাপত্তা অনেকাংশেই এসব গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থাকত। উপনিবেশ আমলের প্রথম দিকেও এই সামাজিক গোষ্ঠীগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

ছোট গ্রামগুলো সাধারণত পরিবার, বংশ ও গোত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত। কিন্তু শহর ও নগরাঞ্চলে সামাজিক সংহতির আরও কিছু রূপ দেখা যেত। এর মধ্যে পাড়া বা মহল্লা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটি মহল্লা শুধু পাশাপাশি কিছু বাড়ির সমষ্টি ছিল না; অনেক ক্ষেত্রে এটি একটি সংগঠিত করপোরেট গোষ্ঠীর মতো কাজ করত। এসব ক্ষেত্রে কোনো মহল্লা আত্মীয়তা বা রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারত। আবার একই ধর্ম, অঞ্চল, পেশা বা অন্য কোনো অভিন্ন পরিচয়ের মানুষও একটি গোষ্ঠী হিসেবে সংগঠিত হতে পারত।

অর্থাৎ, সামাজিক ঐক্যের ভিত্তি সব সময় রক্তের সম্পর্ক ছিল না। কখনো অভিন্ন বিশ্বাস, পেশা বা জীবনযাত্রাও মানুষকে একটি কার্যকর সামাজিক এককে যুক্ত করত। এই বিষয়টি বিশেষ করে শহরাঞ্চলের জন্য বেশি প্রযোজ্য ছিল।

মুসলিম শহরগুলোতে বিভিন্ন ধর্মীয়, আঞ্চলিক ও পেশাগত গোষ্ঠীর স্থায়ী উপস্থিতি ছিল। খ্রিস্টান ও ইহুদিদের নিজস্ব সম্প্রদায় ছিল। একইভাবে আর্মেনীয়, মাগরেবি ও ফ্রাঙ্কদের মতো অভিবাসী জনগোষ্ঠীও নিজেদের সামাজিক পরিচয় ও সংগঠন বজায় রাখত। পাশাপাশি চামড়াশিল্পী, সাবান প্রস্তুতকারক, কুলি, চিকিৎসক, তামা ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য পেশাজীবীরাও সমিতি বা গিল্ড গড়ে তুলতেন। এসব সমিতি বা গিল্ড কেবল পেশাগত স্বার্থ রক্ষা করত না। তারা সদস্যদের সামাজিক নিরাপত্তা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বিরোধ মেটানোর ক্ষেত্র হিসেবেও কাজ করত।

প্রতিটি পাড়া বা মহল্লায় বহু পরিবার ও বাড়িঘর থাকত। এর ভেতরে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের জন্য দোকানপাট, উপাসনালয়, বিদ্যালয়, গণস্নানাগার এবং খাবার পানির ব্যবস্থাও থাকত। মহল্লার ভেতরে ছোট ছোট রাস্তা ও গলি থাকত, যা শহরের প্রধান সড়কের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

অনেক ক্ষেত্রে পুরো মহল্লা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত। প্রধান সড়কের সঙ্গে সংযোগস্থলে এসব প্রাচীরের প্রধান ফটকগুলোতে পাহারার ব্যবস্থা করা হত। এ থেকে বোঝা যায়, মহল্লা শুধু বসবাসের জায়গা ছিল না। এটি ছিল একটি তুলনামূলকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক পরিসর, যেখানে মানুষ একে অপরকে চিনত, একে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন করত, ফলে একে অপরের উপর নির্ভরও করতে পারতো।

যৌথ পরিবার ছিল সামাজিক জীবনের সবচেয়ে স্থায়ী ভিত্তি। পরিবারের সদস্যরা একে অপরের সঙ্গে গভীর সংহতি ও দায়বদ্ধতার সম্পর্কে যুক্ত থাকতেন। পরিবার শুধু অর্থনৈতিক উৎপাদনের একটি একক ছিল না। এটি সদস্যদের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তাও নিশ্চিত করত। কেউ অসুস্থ হলে, দরিদ্র হয়ে পড়লে, বিপদে পড়লে বা কোনো বিরোধে জড়িয়ে গেলে পরিবার তার পাশে দাঁড়াত। ফলে ব্যক্তির জীবন শুধু তার নিজের ওপর নির্ভর করত না; পরিবারের সামগ্রিক শক্তি ও অবস্থানও তার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। এই অর্থে পরিবার মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক সম্পর্কের বড় একটি অংশ নিয়ন্ত্রণ করত।

পরিবার শুধু সদস্যদের কল্যাণ দেখত না; তাদের নৈতিক ও আইনী আচরণও নিয়ন্ত্রণ করত। কারণ পরিবারের একজন সদস্য ভুল বা অপরাধ করলে তার ফল শুধু সেই ব্যক্তিকেই ভোগ করতে হতো না, পুরো পরিবারের সম্মান, সুনাম ও সামাজিক অবস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত। এমনকি যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে আর্থিক দণ্ডের ব্যাপার থাকে, সেসব ক্ষেত্রে পরিবার ও গোষ্ঠীকে পুরোপুরি দায় নিতে হত। অন্যায়ভাবে হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াতের পরিমান হয় অনেক। এই দিয়াত আদায় করতে হত পরিবার ও গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। কারন এত বড় আর্থিক দন্ড সাধারণত একক ব্যক্তির পক্ষে আদায় করা সম্ভব ছিল না। এই কারণেই পরিবারের সদস্যরা একে অপরের আচরণের প্রতি নজর রাখতেন। একজনের কাজকে সবার সম্মানের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করা হতো।

মালয় ভাষার একটি প্রবাদে এই ধারণাটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে: বাবা-মা, সন্তান, ভাই ও বোন—সবাই একই পরিবারের ভাগ্য ও সুনামের অংশীদার। একজন কষ্ট পেলে সবাই সেই কষ্ট অনুভব করে। অর্থাৎ, ব্যক্তির কাজ তখন নিছক ব্যক্তিগত ছিল না। তার কাজের সঙ্গে পুরো পরিবারের নৈতিক পরিচয় ও আর্থ-সামাজিক ভবিষ্যৎ জড়িয়ে থাকত।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে উসমানীয় আমলে বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন গড়ে ওঠে, যেগুলোকে গিল্ড বলা হত। এসব সংগঠন স্থানীয়

পর্যায়ে মধ্যস্থতা ও বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে। তবে গিল্ড প্রতিষ্ঠার আগেও সমাজে বিরোধ মেটানোর জন্য অনেক অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক ছিল। যৌথ পরিবার, বংশ, ধর্মীয় সম্প্রদায়, পাড়া-মহল্লা এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ এই নেটওয়ার্কের অংশ ছিল। অর্থাৎ ইসলামী সমাজে গিল্ড নতুন করে বিরোধ নিষ্পত্তির ধারণা সৃষ্টি করেনি। বরং আগে থেকেই বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থাকে আরও সংগঠিত ও কার্যকর করেছে।

পারিবারিক কলহ বা যৌথ সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ সাধারণত প্রথমে পরিবারের ভেতরেই মেটানোর চেষ্টা করা হতো। পরিবারের প্রধান ব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রে মীমাংসার দায়িত্ব নিতেন। প্রয়োজন হলে বংশ বা পাড়ার কোনো মুরুব্বি মধ্যস্থতা করতেন। গ্রামের ইমাম এবং গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠরাও এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতেন। আদালতে যাওয়ার আগে তারা সালিশ হিসেবে কাজ করতেন। আদালতের নথিপত্রে এমন বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, আদালতের আনুষ্ঠানিক বিচার শুরুর আগেই সামাজিক পর্যায়ে বিরোধ মেটানোর একটি সক্রিয় ব্যবস্থা কাজ করত।

১৬৬৭ সালের মালয় আইন এবং উসমানীয় আইন—উভয় ব্যবস্থাতেই গ্রামের প্রবীণদের বিশেষ দায়িত্ব ছিল। জনশৃঙ্খলা বা সামাজিক শান্তি নষ্ট করতে পারে এমন অপরাধের খবর তারা কর্তৃপক্ষকে জানাতেন। একই সঙ্গে তারা মধ্যস্থতা ও বিরোধ মেটানোর কাজও করতেন। অর্থাৎ, তারা শুধু সরকারের কাছে খবর পৌঁছে দিতেন না; স্থানীয়ভাবে সমাজের শান্তি বজায় রাখতেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন।

অনেক মামলায় বিচারকের কাছে রায় দেওয়ার মতো যথেষ্ট প্রমাণ থাকত না। এমন পরিস্থিতিতে বিচার শুরুর আগে বা বিচার চলাকালেই মধ্যস্থতাকারীরা দুই পক্ষের মধ্যে আপস করানোর চেষ্টা করতেন। অনেক সময় বিচারক নিজেও পক্ষগুলোকে সমঝোতার পরামর্শ দিতেন। ফলে সব বিরোধের শেষ পরিণতি বিচারকের আনুষ্ঠানিক রায়ের মাধ্যমে হতো না। অনেক বিরোধ সমঝোতার মাধ্যমেই শেষ হয়ে যেত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা আদালত পর্যন্ত যেত, সেগুলোতেও দেখা যেত অনেক মামলা মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে শেষ হয়ে গেছে।

এই মধ্যস্থতাকারীরা কখনো মামলার পক্ষগুলোর আত্মীয়স্বজন বা একই মহল্লার বাসিন্দা হতেন। আবার কখনো আদালতের কোনো কর্মীকে বিশেষভাবে বিরোধ মেটানোর দায়িত্ব দেওয়া হতো। আদালতের ভেতরে বা বাইরে মধ্যস্থতা সফল হলে বিচারক সাধারণত মামলাটি বন্ধ করে দিতেন। এ থেকে বোঝা যায়, আদালতের লক্ষ্য শুধু রায় দেওয়া ছিল না। সম্ভব হলে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করে বিরোধ শেষ করাও ছিল তার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

"আপস-মীমাংসাই সর্বোত্তম সমাধান"—এই নীতি ইসলাম ও ইসলামী আইনের দীর্ঘ ঐতিহ্যের অংশ।

এর ভেতরে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও আইনী ধারণা রয়েছে। সালিশ ও মধ্যস্থতা শুধু আনুষ্ঠানিক আইনী ব্যবস্থার সহায়ক অংশ ছিল না; অনেক ক্ষেত্রে আদালতের বিচারের চেয়েও এগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো।

আদালত বিরোধ নিষ্পত্তির প্রথম ছিল না। বরং অন্য সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে আদালতে যাওয়াকে শেষ উপায় হিসেবে দেখা হতো। এমনকি আদালতে যাওয়ার পরেও তা মীমাংসার চেষ্টা করা হত। যে সমাজে পারিবারিক সম্পর্ককে অত্যন্ত পবিত্র মনে করা হতো,

সেখানে ব্যক্তিগত ও গোপন বিরোধ জনসমক্ষে প্রকাশ করা ভালো চোখে দেখা হতো না এবং জনসম্মুখে আসতে দেওয়া হতো না।

তবে আদালতে একেবারে কম মামলা যেত, এমনও না। কিন্তু তার চেয়েও বেশি বিরোধ স্থানীয় পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে মিটিয়ে ফেলা হতো। এসব ক্ষেত্রে মুরুব্বি, ইমাম, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নারী এবং সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিরা মধ্যস্থতা করতেন। অনানুষ্ঠানিক মধ্যস্থতার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল বিরোধকে বড় সংঘাতে পরিণত হতে না দেওয়া।

এসব সমাজে একজন ব্যক্তির পরিচয় তার পরিবার, বংশ বা সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। তাই দুজন ব্যক্তির বিরোধ সহজেই দুই পরিবার বা দুই গোষ্ঠীর বড় রাজনৈতিক ও সামাজিক বিরোধে রূপ নিতে পারত। এই কারণে পারিবারিক পবিত্রতা বা গোপনীয়তা রক্ষা এবং সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখা—দুটি বিষয়কে আলাদা করে দেখা হতো না। স্থানীয় পর্যায়েই বিরোধ মিটিয়ে ফেলার মাধ্যমে বৃহত্তর সামাজিক অশান্তির ঝুঁকি আগেভাগে ঠেকানো হতো।

?????

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, বিচারকেরা অনানুষ্ঠানিক সালিশ এবং আদালতের বিচার—দুই পথেই বিরোধ মেটাতে ভূমিকা রাখতেন। তবে আদালতের বিচারও সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। এটি এমন এক সামাজিক কাঠামোর অংশ ছিল, যেখানে একজন জিতবে এবং অন্যজন সব হারাবে—এই নীতির চেয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার ও নৈতিকতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। অর্থাৎ, বিচারের লক্ষ্য শুধু জয়-পরাজয় নির্ধারণ করা ছিল না। সামাজিক ভারসাম্য ও সম্পর্ক রক্ষা করাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

বিচারের উদ্দেশ্য ছিল বিরোধের আগে পক্ষগুলোর মধ্যে যে সামাজিক সম্পর্ক ছিল, সম্ভব হলে তাদের আবার সেই সম্পর্কে ফিরিয়ে নেওয়া। এজন্য সামাজিক ও নৈতিক সমঝোতা প্রয়োজন হতো। চেষ্টা করা হতো যেন উভয় পক্ষই অন্তত কিছুটা লাভবান হয় এবং একজনের সম্পূর্ণ পরাজয় না ঘটে। তবে এমন কাজ যদি কেউ করে যার মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি ও নৈতিক শৃঙ্খলার এমন ক্ষতি হয়েছে, যা আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, তখন তার ক্ষেত্রে পূর্ন পরাজয়ের ব্যাপারটি ঘটত।

এই ব্যবস্থায় বিচারকের প্রধান কাজ শুধু আইনের নিয়ম কঠোরভাবে প্রয়োগ করা ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল এমন একটি সমাধান তৈরি করা, যাতে বিরোধী পক্ষগুলো সম্ভব হলে আগের সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে এবং আবার স্বাভাবিক সামাজিক জীবনে ফিরে যেতে পারে।

আইন প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক পুনর্গঠনও বিচারের একটি কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য ছিল। কখনো কখনো আগের সম্পর্ক ফিরিয়ে আনা সম্ভব হতো না এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হতো, এটা ঠিক তবে চেষ্টা করা হতো যেন অপরাধী বা বিবাদী তার নৈতিক মর্যাদা পুরোপুরি হারিয়ে না ফেলে (বিবাদী যদি অপরাধী হয় তাহলে তার নৈতিক পরাজয় এবং ফলশ্রুতিতে সামাজিক ভাবে হেয় হওয়া আধুনিক বিচার ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি)। মুসলিম আদালতের পরিবেশ ছিল তুলনামূলকভাবে অনানুষ্ঠানিক ও উন্মুক্ত। বিচারপ্রার্থী, তাদের আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও বন্ধুরা সহজেই নিজেদের কথা বলতে পারতেন। এর ফলে উভয় পক্ষের সম্মান ও সামাজিক সুনাম রক্ষার সুযোগ তৈরি হতো।

আদালতে সবার কথা শোনার সুযোগ থাকায় পরাজিত পক্ষও কিছুটা নৈতিক মর্যাদা ধরে রাখতে পারত। তার আত্মপক্ষ সমর্থনের মাধ্যমে বোঝা যেত, কোন পরিস্থিতি বা চাপে সে অপরাধ বা ভুলটি করেছিল। এতে তার আইনী দায় দূর না হলেও সমাজের চোখে তার কাজের একটি ব্যাখ্যা তৈরি হতো। এই ব্যাখ্যা তাকে এক ধরনের নৈতিক ছাড় দিত, যা অনেকাংশে আইনী ছাড়ের কাছাকাছি মনে হত।

অপরাধের জন্য আইনী শাস্তি হয়তো এড়ানো যেত না। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে অপরাধটি ঘটেছে, তা আদালতে ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকায় পরাজিত ব্যক্তি এবং তার পরিবার সামাজিকভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারত। কারণ অপরাধীর সামাজিক পরিচয়ের সঙ্গে তার পরিবার ও স্বজনদের পরিচয়ও যুক্ত ছিল। বিচার শেষে তাদেরও সমাজে ফিরে স্বাভাবিক জীবন চালাতে হতো। তাই অপরাধীর কিছু নৈতিক মর্যাদা রক্ষা করা তার পরিবার ও গোষ্ঠীর সামাজিক পুনর্বাসনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের এই নৈতিক ভিত্তিই ছিল এমন এক মাধ্যম, যার সাহায্যে ইসলামী আদালত তার জনমুখী কাঠামোর দ্বারা সামাজিক শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি রক্ষা করতে পারত। আর এটাই ছিল ইসলামী আদালতের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

সামাজিক ন্যায়বিচার (Social equity) অর্থাৎ বিচারের ক্ষেত্রে সবাই সমান এই নীতির বাস্তবায়ন ছিল ইসলামী আদালতের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই ন্যায়বিচারকে শুধু আইনী নিয়ম দিয়ে নয়, নৈতিকতার মানদণ্ডেও বিচার করা হতো। ধনী ও প্রভাবশালী মানুষের মর্যাদা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি দুর্বল ও বঞ্চিত মানুষের নৈতিক দাবি ও প্রয়োজনও সমান গুরুত্ব পেত। কারণ তারাও সমাজের পূর্ণ সদস্য ছিল। তাই আদালতের দায়িত্ব ছিল ধনীদের মতো দুর্বলদের প্রতিও সমান দৃষ্টি দেওয়া এবং প্রয়োজন হলে তাদের প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হওয়া।

মুসলিম আদালতের অনানুষ্ঠানিক ও উন্মুক্ত পরিবেশে বিচারপ্রার্থী এবং তার সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষীরা মামলার বিশেষ পরিস্থিতি ও নৈতিক দিকগুলো তুলে ধরতে পারতেন। একই সঙ্গে আদালত আইন ও ন্যায়বিচারের সাধারণ নীতির প্রতিও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। ফলে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল যে আদালত একই সাথে যেমন দুর্বলের ওপর অন্যায় হতে দেবে না, তেমনি প্রভাবশালীর অন্যায়ও দমন করবে। এই বিশ্বাস শুধু মুখের বুলির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল না বরং এটি শত শত বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি হয়েছিল।

কৃষকেরা অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা জিততে পারত। ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও মুসলিম ব্যবসায়ী বা প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে, এমনকি গভর্নর বা সুবাদারের মতো শক্তিশালী শাসকের বিরুদ্ধেও আদালতের রায়ে জয়ী হতে পারত। এভাবে মুসলিম আদালত এমন একটি উন্মুক্ত বিচারালয়ে পরিণত হয়েছিল, যেখানে যে কেউ নিজের অধিকার রক্ষার জন্য যেতে পারত।

আধুনিক আদালতের জটিল আনুষ্ঠানিকতা ও ব্যয়বহুল আইনজীবী-নির্ভর ব্যবস্থা তখন ছিল না। এ ধরনের জটিলতা অনেক সময় বিচারপ্রার্থীর নিজের বক্তব্য ও নৈতিক অনুভূতিকে আড়াল করে দেয়। বিচার প্রার্থীর পক্ষে নিজের অধিকারের কথা আদালত বা আইনজীবীর কাছে নিজের মত করে উপস্থাপন করা বর্তমান সময়ে খুবই কঠিন। কারণ তারা এটাও জানেনা যে চলমান সংবিধান বা আইন তাকে কি অধিকার দেয় আর কি দেয় না। ফলে দেখা যায় কোন ভুক্তভোগী কোন অভিযোগ করতে চাইলে আদালতের যাওয়ার আগেই আইনজীবীরা আইনের দোহায় দিয়ে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়। ইসলামী আদালতে এই সমস্যা একেবারেই ছিল না।

শরীয়াহ কাকে কি অধিকার দেয় তা সমাজের প্রত্যেকেই জানতো। এমনকি অমুসলিম অধিবাসীরাও ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী তাদের অধিকার সম্পর্কে পুরো ওয়াকিবহাল ছিল।

আইনজীবীর খরচ ও দীর্ঘ আইনী লড়াইয়ের ব্যয় তখন দরিদ্র মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার পথে বড় বাধা ছিল না। কারণ তখন আইনজীবীদের প্রয়োজনই ছিল না। সবাই নিজের কথা সরাসরি কাজীকে বলতে পারত। ঠিক এই জায়গাতেই মুসলিম আদালত সফল হয়েছিল, আর আধুনিক আদালত হয়েছে ব্যার্থ। এটি এমন এক আশ্রয়স্থলের মতো কাজ করত, যেখানে দরিদ্র ও দুর্বল মানুষও ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জয়ী হতে পারত।

সাম্প্রতিক নানা গবেষণায় দেখা গেছে যে, মুসলিম আদালতে নারী বিচারপ্রার্থীরা কেবল ন্যায়বিচারই পাননি, বরং অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর চেয়ে আরও বেশি সুরক্ষা পেয়েছেন। আর্থিক লেনদেন বা অন্যান্য বিষয়ে আদালতে যাওয়ার সহজ সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিপুল সংখ্যক নারী আইনী অঙ্গনে নিজেদের দাবি তুলে ধরতেন। আর আদালতে গিয়ে তারা পুরুষদের চেয়ে কোনো অংশে কম না গিয়ে, বরং সমান জোর দিয়ে নিজেদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতেন।

সম্মান ও পবিত্রতা ভিত্তিক সামাজিক ও নৈতিক সুরক্ষাকে সম্বল করে নারীরা আদালতের ভেতরে ও বাইরে তাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতেন। আর কখনো যদি আইনী নীতিমালা তাদের অধিকারের পথে কিছুটা বাধা হয়ে দাঁড়াত, তবে তারা এমন কৌশল অবলম্বন করতেন যা আদালতের ভেতরেই স্বীকৃত ও গৃহীত হতো।

আদালত সমাজ ও সামাজিক নৈতিকতার সঙ্গে কতটা গভীরভাবে যুক্ত ছিল, তা দুটি বিষয় থেকে বোঝা যায়। প্রথমত, আদালতের সাথে সম্পৃক্ত সবাই স্থানীয় সমাজেরই অংশ ছিলেন। দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষের মধ্যেও আইনী সচেতনতা ছিল। কাজী সাধারণত সেই সমাজ ও সংস্কৃতিরই মানুষ হতেন, যেখানকার বিরোধ তিনি মেটাতেন। তাই সমাজের সম্পর্ক ও নৈতিক কাঠামো রক্ষা করা তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সালিশ ও মধ্যস্থতার উদ্দেশ্য যদি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের নৈতিক অনুভূতি রক্ষা করা হয়, তবে কাজীকেও আদালতের ভেতরে এই লক্ষ্যগুলো বিবেচনা করতে হতো। প্রতিটি মামলাকে আলাদাভাবে এবং তার নিজস্ব সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করা হতো। বিচারপ্রার্থীদের আইনী ব্যবস্থার নিছক যন্ত্রাংশ হিসেবে দেখা হতো না। তাদের বৃহত্তর সমাজের অংশ হিসেবে দেখা হতো—যারা সমাজকে প্রভাবিত করে এবং নিজেরাও সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

কাজী বিচারপ্রার্থীদের সামাজিক সম্পর্কের অংশ হিসেবে দেখতেন। তবে এটি শুধু বিচার শুরুর আগের কোনো ঘরোয়া মীমাংসা ছিল না। আবার আধুনিক আদালতের মতো এমনও ছিল না যে একজন সব পাবে আর অন্যজন সব হারাবে। আধুনিক ব্যবস্থায় বিচারক অনেক সময় বিচারপ্রার্থীদের সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন। মুসলিম আদালতে কাজী সাধারণত সেই সামাজিক বাস্তবতার ভেতরেই অবস্থান করতেন। কাজী মূলত দুই ধরনের দাবির মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করতেন। একদিকে ছিল সমাজ ও নৈতিকতার দাবি, যার অংশ তিনি নিজেও ছিলেন। অন্যদিকে ছিল আইনের নিয়ম। তবে এই আইনও সামাজিক নৈতিকতা ও অলিখিত রীতিনীতির গুরুত্ব স্বীকার করত। তাই আইন ও নৈতিকতাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখা হতো না। ইসলামী আদালতে শুধু কাজী

একাই সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। আদালতের সাক্ষী, কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মীরাও একই সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অংশ ছিলেন।

আদালতে শুধু ঘটনা সত্য কি না, তা যাচাই করা হতো না। মামলার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ বাদী-বিবাদী, স্বাক্ষীর নৈতিক চরিত্র, সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতাও গুরুত্বের সঙ্গে পরীক্ষা করা হতো। কারণ সাক্ষ্যের মূল্য অনেকাংশে নির্ভর করত সাক্ষ্যদাতার চরিত্রের ওপর। কাজীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল সৎ ও নৈতিক চরিত্রের কিছু কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা। তাদের বলা হতো 'প্রত্যয়নকারী সাক্ষী'।

তাদের কাজ ছিল মামলার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের, বিশেষ করে ঘটনার সাক্ষীদের চরিত্র ও বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করা। অর্থাৎ, তারা শুধু সাক্ষ্য শুনতেন না; সাক্ষ্যদাতা সত্যবাদী ও নৈতিকভাবে বিশ্বস্ত কি না, সেটিও পরীক্ষা করতেন।

প্রত্যয়নকারী সাক্ষীরা আদালতের স্থায়ী সদস্য ছিলেন। তাদের স্থানীয় রীতিনীতি, সামাজিক সম্পর্ক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হতো। এই জ্ঞান ছাড়া তারা সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করতে পারতেন না। আর সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করা না গেলে আদালতের বিচারপ্রক্রিয়ার মূল ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়ত।

সাক্ষ্যের মূল ভিত্তি ছিল নৈতিক বিশ্বস্ততা। একজন মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও সুনাম তার কথার বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ধারণ করত। তাই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া মানে শুধু আইনের বিরুদ্ধে যাওয়া নয়। এর অর্থ ছিল নিজের সামাজিক সুনাম, সম্মান ও সম্পর্কের পুরো নেটওয়ার্ককে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা। পারস্পরিক দায়বদ্ধতার ওপর গড়ে ওঠা সমাজে এই ক্ষতি ছিল অত্যন্ত গুরুতর। প্রতিটি মামলা আদালতের নথিতে লিখে রাখা হতো। কার্যবিবরণীর শেষে দুই বা ততোধিক প্রত্যয়নকারী সাক্ষী স্বাক্ষর করতেন।

আদালত থেকে নিয়োগ ও বেতন পাওয়া এসব সাক্ষী সাধারণত সমাজের উচ্চশ্রেণি থেকে আসতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরিচিত ফকিহ বা আলিম বা স্থানীয় প্রভাবশালী ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তবে মামলার পক্ষগুলোর সঙ্গে আসা সাধারণ সাক্ষীরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করতেন, বিশেষ করে নিম্নবিত্ত মানুষের।

মামলার নথির নিচে সাক্ষীদের স্বাক্ষর আদালতের কাজের ওপর সামাজিক নজরদারি ও জনস্বীকৃতির মতো কাজ করত। একই সঙ্গে এসব নথি স্থানীয় ইতিহাস ও পূর্ববর্তী মামলার স্মৃতি সংরক্ষণ করত। এই সাক্ষীরা আদালতের কার্যক্রমের সামাজিক পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করতেন এবং বিচারপ্রক্রিয়ার নৈতিক সততা রক্ষা করতেন। অন্যদিকে আদালতের আইনী বিশেষজ্ঞরা, যারা সাধারণত মুফতি হতেন, নিশ্চিত করতেন যে আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ হচ্ছে।

আদালতের পেশকার বা লেখকও স্থানীয় সমাজের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি বিচারপ্রক্রিয়ার বিবরণ লিখে রাখতেন এবং সাধারণত নিজেও আইন সম্পর্কে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ হতেন। সমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আদালত ও সাধারণ মানুষের মধ্যকার যোগসূত্রকে আরও শক্তিশালী করত। আইনী ও সামাজিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখায় পেশকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। এজন্য অভিজ্ঞ পেশকারদের অনেককেই পরবর্তীতে সহকারী কাজী হিসেবেও নিয়োগ দেওয়া হতো।

বিচারপ্রার্থী ও সাধারণ মানুষ বড় কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই কাজীর সামনে হাজির হতে পারতেন। ইসলামী আইনে পেশাদার মধ্যস্থতাকারী বা আইনজীবীর কোন ব্যবস্থা ছিল না। এজন্য তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা তুলে ধরতেন। আধুনিক আদালতের মতো কঠোর আমলাতান্ত্রিক নিয়ম মানতে হতো না। মানুষ জটিল আইনী পরিভাষা ছাড়াই একদম নিজের ভাষায় নিজের বক্তব্য পেশ করতে পারত।

এটি সম্ভব হয়েছিল কারণ ইসলামী বিচারব্যবস্থায় আদালত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বড় কোনো দূরত্ব ছিল না। একজন মানুষ দরিদ্র বা অশিক্ষিত হলেও সরাসরি আদালতে গিয়ে নিজের কথা বলতে পারত। তার সামাজিক অবস্থান দুর্বল হলেও আদালতের দরজা তার জন্য বন্ধ ছিল না। এমনকি সংকুচিতও ছিল না।

আদালত ও মানুষের মধ্যে দূরত্ব কম থাকার কৃতিত্ব শুধু কাজী বা আদালতের ছিল না। এ কৃতিত্ব সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের ও দিতে হবে। কারণ সাধারণ মানুষ আইন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। আদালত যেমন সমাজের নৈতিক জগতের অংশ ছিল, তেমনি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম সমাজও শরিয়াহভিত্তিক মূল্যবোধের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। মানুষ দৈনন্দিন জীবনেই আইন ও নৈতিকতার নিয়ম অনুসরণ করত। কারণ এগুলো তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক আচরণের অংশ ছিল। এই কারণে প্রাক-আধুনিক মুসলিম সমাজে আইন ছিল একটি জীবন্ত ও চর্চিত ঐতিহ্য।

আইন যেহেতু জীবন্ত সামাজিক ঐতিহ্যের অংশ ছিল, তাই সাধারণ মানুষও আইন সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা রাখত। আইনী জ্ঞান সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে ছিল এবং সহজেই পাওয়া যেত। মুফতি ও অন্যান্য ফকিহগন বিনা মূল্যে আইনী পরামর্শ দিতেন। ফলে দরিদ্র, নিপীড়িত ও অবহেলিত মানুষও আদালতে যাওয়ার আগেই নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারত। তারা বাদী হিসেবে অধিকাংশ মামলায় জয়ী হতো—এ থেকে বোঝা যায় যে তাদের আইনী প্রস্তুতি ছিল।

বর্তমানে যেমন কেবল আইনী পরামর্শ নিতেই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়, ইসলামী সমাজে সাধারণ মানুষের আইনী পরামর্শদাতারা ব্যয়বহুল আইনজীবী ছিলেন না। তাই অধিকার আদায়ের খরচ মূল দাবির চেয়ে বেশি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও ছিল না। তাদের ভাষাও বর্তমান আইনজীবীদের মত দুর্বোধ্য ছিল না। তাদের সমাজের অংশ ছিলেন, সমাজের সবার মতই কথা বলতেন।

সামাজিক জীবনে আইনী জ্ঞানের এই বিস্তার একদিনে তৈরি হয়নি। এটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গড়ে ওঠা একটি ঐতিহ্য ছিল। তরুণ আইনশিক্ষার্থী, মুফতি ও ইমামরা নিয়মিতভাবে এই জ্ঞান সমাজে ছড়িয়ে দিতেন। বিচারক ও শিক্ষিত ব্যক্তিরাও যখন পরিচিতদের বাড়িতে যেতেন বা রাস্তায় হাটতেন বা বাজারে কেনাকাটা করতে যেতেন তখন তারা মানুষের নানা প্রশ্নের উত্তর ও পরামর্শ দিতেন। ফলে সাধারণ মানুষ আদালতে এমন ভাষায় কথা বলতে পারত, যা বিচারক সহজে বুঝতেন। আবার বিচারকের আইনী বা নৈতিক পরিভাষাও সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত ছিল।

আইন ও সামাজিক নৈতিকতা একে অপরের থেকে আলাদা ছিল না। বরং একটি অন্যটিকে শক্তিশালী ও স্থায়ী করত। সংক্ষেপে বলা যায়, মুসলিম আদালত শুধু একটি আইনী প্রতিষ্ঠান ছিল না; এটি একই সঙ্গে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানও ছিল। যে সমাজের মধ্যে

এটি গড়ে উঠেছিল এবং পরিচালিত হতো, আদালত ছিল সেই সমাজেরই এক অনন্য সৃষ্টি।

????

এই অধ্যায় শেষ করার আগে নারীদের সাথে আইনের সম্পর্ক নিয়ে আরও কিছু আলোচনা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমাদের প্রধান উৎস আদালতের নথিপত্র। কিন্তু এসব নথি থেকে মামলায় জড়িত নারীদের সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে সব তথ্য জানা যায় না। তাদের পরিবার বা সামাজিক গোষ্ঠী তাদের কীভাবে দেখত, বৃহত্তর সমাজে তাদের মর্যাদা কেমন ছিল, কিংবা প্রভাবশালী ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের আইনী সুযোগ পাওয়ার মধ্যে কী পার্থক্য ছিল—এসব বিষয় আদালতের নথিতে সব সময় স্পষ্ট নয়। তাই পাওয়া তথ্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা সম্পূর্ণ নয়।

তবে একটি বিষয় খুব পরিষ্কার, আর তা হলো—বিচার প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির নিজস্ব সততা ও নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। বাস্তবে এটি এমন সব সিদ্ধান্ত ও রায়ে রূপ নিত, যা নারীদের পক্ষেই যেত—বিশেষ করে যদি সেই নারী নিজে নীতিবান হতেন কিংবা উচ্চ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী কোনো নারী সাক্ষী তার পক্ষে দাঁড়াতেন।

আইনী সাক্ষ্য-প্রমাণ যদি হয় সেই সুতা যার ওপর ন্যায়বিচার ঝুলে থাকে, তবে নীতিপরায়ণতা ও নৈতিক চরিত্র হলো সেই আঁশ যা দিয়ে ওই সুতা তৈরি হয়। আর এই নীতিপরায়ণতা ও নৈতিকতার চর্চা পুরুষদের মতো নারীদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য ও সত্য ছিল। সাক্ষ্য তখনই মূল্যবান হতো, যখন সাক্ষ্যদাতাকে নৈতিকভাবে বিশ্বস্ত বলে মনে করা হতো।

ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে নারী পূর্ণাঙ্গ আইনী অধিকারের অধিকারী—এই স্বীকৃতিই মুসলিম আদালতে তাদের সক্রিয় উপস্থিতির প্রধান ভিত্তি ছিল। পুরুষদের মতো নারীরাও নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জেনে আদালতে যেতেন। তাদের বিশ্বাস ছিল, আদালত তাদের কথা শুনবে, ন্যায়বিচার করবে এবং তাদের অধিকার রক্ষা করবে। এই আস্থা ছাড়া নারীদের এত নিয়মিত আদালতে যাওয়া সম্ভব হতো না।

অনেক নারী নিজেরাই আদালতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের মামলা পরিচালনা করতেন। তবে উচ্চবিত্ত পরিবারের নারী, অনেক পুরুষ এবং অমুসলিম নারীরা কখনো কোনো পুরুষ আত্মীয়, গৃহকর্মী বা ব্যবসার ব্যবস্থাপককে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাতেন। কিন্তু নারীরা যখন নিজেরা আদালতে আসতেন, তখন তারা পুরুষদের সমান মর্যাদায় উপস্থিত হতেন। তারা স্বাধীনভাবে, স্পষ্ট ভাষায় এবং দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেদের বক্তব্য পেশ করতেন।

নারীরা সরাসরি ও স্পষ্ট ভাষায় কথা বললে আদালত তাদের বক্তব্য বুঝতে চেষ্টা করত। নিজেদের সম্মান, সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক স্বার্থ রক্ষার জন্য আদালত তাদের পর্যাপ্ত সুযোগ দিত। নারীরা বাদী ও বিবাদী—দুই ভূমিকাতেই আদালতে আসতেন। তারা পুরুষের বিরুদ্ধে যেমন মামলা করতেন, তেমনি অন্য নারীর বিরুদ্ধেও মামলা করতেন। মুসলিম নারী খ্রিস্টান বা ইহুদি নারী-পুরুষের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারতেন। আবার খ্রিস্টান ও ইহুদি নারীরাও মুসলিমদের বিরুদ্ধে মামলা করতেন। মুক্তি পাওয়া দাসীরাও তাদের সাবেক মালিকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করতে পারতেন। পাওনা টাকা না দেওয়া বা চুক্তির শর্ত ভাঙার অভিযোগে তারা অন্য সাধারণ মানুষের মতোই আইনী প্রতিকার চাইতেন।

নারীরা ক্ষতিপূরণ, বিবাহবিচ্ছেদ, খোরপোষ, সন্তানের ভরণপোষণ ও জিম্মাদারি এবং মানহানির প্রতিকার চেয়ে মামলা করতেন। তারা অন্য নারীর বিরুদ্ধেও মামলা করতেন। আবার পুরুষেরাও নারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারতেন। অর্থাৎ, নারীরা আইনী ব্যবস্থার সক্রিয় ও পূর্ণ অংশীদার ছিলেন। অধিকাংশ প্রাক-আধুনিক ইসলামী সমাজ ছিল লিঙ্গভিত্তিক। অর্থাৎ সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিক। নারী ও পুরুষের সামাজিক ভূমিকা, দায়িত্ব ও আইনী অবস্থান সব ক্ষেত্রে এক ছিল না। ইসলামী আইনও অনেকাংশে এই সামাজিক কাঠামোকেই স্বীকৃতি দিয়েছিল। একই কারণে আদালতের নথি ও বিচারিক ভাষায় পুরুষ ও মুসলিম পরিচয় নারী ও অমুসলিম পরিচয়ের তুলনায় বেশি সামাজিক মর্যাদা পেত। তবে এই পারিভাষিক অসমতার অর্থ এই নয় যে নারী ও অমুসলিমরা আদালতে অধিকারহীন ছিল।

তারা নিজেরা সম্পত্তির পূর্ণ মালিক হতে পারত। তাদের আইনী ও নৈতিক সক্ষমতা স্বীকৃত ছিল। তারা যেকোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করতে পারত। পারিভাষিক অসমতার কারণে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তাদের প্রতি কোন রকম অবিচার বা অন্যায়ের কোন সুযোগ ছিল না ইসলামী আদালতে। অমুসলিম নারীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ছিল।

আদালতের ভাষায় তারা নারী ও অমুসলিম—দুই পরিচয়ের কারণেই তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবতা হল, আইনী অধিকার ও সামাজিক ক্ষমতা, কোন ক্ষেত্রেই তারা মুসলিম নারীদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। এসব ব্যাপারে তারা সুবিধাবঞ্চিতও ছিল না। এ কথাও সত্য যে, ইসলামী আইনে অনেক ক্ষেত্রেই একজন নারীর সাক্ষ্যের মূল্য পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক ধরা হতো। **[1]**

তবে স্বাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে এই ধরনের আইনী বৈষম্য নারীদের বাস্তব জীবন ও অভিজ্ঞতায় কী প্রভাব ফেলত, সে সম্পর্কে আমাদের কাছে খুব কম তথ্যই আছে। এই নিয়ম তাদের বিবাহ, পরিবার ও সম্পত্তির অধিকারে কোন ধরনের বাস্তব বাধা সৃষ্টি করত কিনা তা ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়না। এজন্য এ নিয়মকে বর্তমানের পশ্চিমা লিবারেল বিশ্বের সাথে তুলনীয় করে না দেখে দেখতে হবে তখনকার নারীদের এ ব্যাপারে কি রকম চিন্তা ছিল। এই ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনরকম হীনমন্যতা ছিল কিনা, এটাকে তারা স্বাভাবিকভাবে গ্রহন করত কিনা সেটাই মূল বিষয়।

তবে যতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায়, তা থেকে বলা যায়—সাক্ষ্যদানের এই বৈষম্যমূলক নিয়মের প্রভাবে মুসলিম নারীদের অবস্থান তৎকালীন ইউরোপীয় নারীদের তুলনায় বেশি খারাপ ছিল না। অর্থাৎ, আইনী নিয়মে বৈষম্য থাকলেও বাস্তব সামাজিক ও সম্পত্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রে মুসলিম নারীরা অনেক সময় তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী অবস্থানে ছিলেন। নারীর সাক্ষ্য কম মূল্যায়িত হলেও বাস্তবে তা তাদেরকে কোন ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেয়নি। এটি তাদেরকে আদালতে অংশগ্রহণ থেকে সরিয়ে দেয়নি। ফৌজদারি ও দেওয়ানি—দুই ধরনের মামলাতেই নারীরা বাদী ও বিবাদী হিসেবে হাজির হতেন।

তাদের অধিকাংশ মামলা অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে হলেও আইনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা সক্রিয় ছিলেন। এই উপস্থিতি দেখায় যে সাক্ষ্যসংক্রান্ত বৈষম্য তাদের আইনী ক্ষমতাকে অকার্যকর করেনি।

আদালত অনেক সময় অপ্রাপ্তবয়স্কদের অভিভাবক হিসেবে নারীদের অগ্রাধিকার দিত। এতিমদের অর্থ ও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া

সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব নারীদের দেওয়া হতো। এই কাজের জন্য তারা পারিশ্রমিকও পেতেন। নিজেদের খামার, কৃষি সরঞ্জাম, তাঁত, গবাদিপশু বা দাস-দাসী সংক্রান্ত বিষয়ে নারীরা আদালতে মামলা করতেন। একইভাবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের অধিকার রক্ষার জন্যও তারা আদালতে সক্রিয়ভাবে লড়তেন।

সম্পত্তিসংক্রান্ত বহু মামলার মূল বিষয় ছিল বকেয়া দেনমোহর, বিবাহবিচ্ছেদের পর পাওনা অর্থ এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পদের বন্টন। এসব মামলায় নারীরা নিয়মিত আদালতে আসতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাদী হতেন। তাদের এই সক্রিয় উপস্থিতি প্রমাণ করে যে সামাজিক ও আইনী ব্যবস্থায় তাদের অবস্থান তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ছিল।

তখনকার আইনী চর্চা থেকে বোঝা যায়, বিবাহবিচ্ছেদ একজন স্বামীর জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল। কখনো তা তাকে প্রায় নিঃস্বও করে দিত। বিবাহবিচ্ছেদের পর স্ত্রী অন্তত তিন মাসের খোরপোষ, বকেয়া দেনমোহর, সন্তানের ভরণপোষণ এবং স্বামীর কাছে থাকা ঋণ ফেরত পাওয়ার অধিকার রাখতেন। সন্তান ছোট হলে দুধপানের জন্য আলাদা অর্থও দাবি করতে পারতেন। স্বামী যদি বিবাহিত জীবনে তার আর্থিক দায়িত্ব ঠিকমতো পালন না করতেন, তবে বিচ্ছেদের সময় সব বকেয়া একসঙ্গে পরিশোধ করতে হতো।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, অনেক নারী বিয়ের সময়ই উল্লেখযোগ্য সম্পদ বা পুঁজি নিয়ে সংসারে প্রবেশ করতেন। এই কারণেই অনেক স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে ঋণ নিতেন।একই কারণে কোন কোন নারী টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ, স্ত্রী শুধু স্বামীর ওপর নির্ভরশীল অর্থনৈতিক সত্তা ছিলেন না; অনেক সময় তিনি নিজেই পুঁজির মালিক ও ঋণদাতা ছিলেন।

বিয়ের সময় স্ত্রী তাৎক্ষণিক দেনমোহর পেতেন। কখনো কখনো কিছু পরিমান দেনমোহর বাকি থাকতো, যা তিনি পরে দাবি করতে পারতেন। এগুলো তার আর্থিক ও বস্তুগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করত। এর পাশাপাশি মা-বাবা কনেকে আসবাব, পোশাক, গহনাপত্র দিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে নগদ অর্থও দিতেন, যা মূলত তার পৈতৃক সম্পত্তিতে তার নিজের অংশেরই একটি রূপ ছিল। অনেক নারী বিয়ের আগে বা বিয়ের সময় ওয়াকফ সম্পত্তির অংশও উপহার হিসেবে পেতেন। সেখান থেকে তারা নিয়মিত আয় করতে পারতেন। বিয়ের উপহার বা সম্পদ যে রূপেই আসুক, নারীরা তার একচ্ছত্র মালিকানা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তারা জানতেন, এই সম্পদ অন্য কারও জন্য ব্যয় করা তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব নয়। এমনকি নিজেদের দৈনন্দিন খরচও তাদের নিজ সম্পদ থেকে বহন করতে হতো না।

নারীরা নিজেদের অর্থ তখনই ব্যয় করতেন, যখন তারা নিজেরা তা চাইতেন। খাদ্য, বাসস্থান ও পোশাকের খরচ বহন করার দায়িত্ব ছিল স্বামীর। স্ত্রীকে নিজের সম্পদ থেকে সংসারের ব্যয় মেটাতে হতো না। ফলে সংসারের পেছনে খরচ করতে গিয়ে স্বামীর সম্পদ কমলেও স্ত্রীর সম্পদ কমত না, বরং সম্পদ সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও বৃদ্ধির সুযোগ পেত। শত শত বছর ধরে এসব অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকায় নারীদের সম্পদ জমাতে সাহায্য করেছে।

এই বাস্তবতা বিবেচনায় নিলে ঐতিহাসিক নথিতে এটা দেখতে পাওয়া আশ্চর্যজনক হবে না যে, স্বামীর একতরফা তালাকের চেয়ে 'খোলা' (একধরনের চুক্তির মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ, যেখানে স্ত্রী তালাকের বিনিময়ে তার কিছু আর্থিক অধিকার ছেড়ে দিতেন, তালাক মূলত স্বামীর পক্ষ থেকে হয়। আর খোলা হয় স্ত্রীর পক্ষ থেকে, তবে তাকে তার মোহরানা না প্রাপ্য অর্থনৈতিক অধিকার থেকে কিছু

ছাড় দিতে হয়) বেশি হত সেসময়। ইস্তাম্বুল, আনাতোলিয়া, সিরিয়া, মুসলিম সাইপ্রাস, মিসর এবং ফিলিস্তিনে খোলার এই তুলনামূলক ব্যাপক প্রচলনের বিষয়টি ইতিহাসবিদদের লেখায় গুরুত্বের সাথে উঠে এসেছে।

এই ঘটনাটি সেই সময়ে মুসলিম সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে তোলে:

প্রথমত, স্বামী একতরফাভাবে তালাক দিতে পারতেন ঠিকই, কিন্তু এই ক্ষমতা ব্যবহার করা তার জন্য আর্থিকভাবে ব্যয়বহুল ছিল। তালাক দিলে তাকে স্ত্রীর বকেয়া দেনমোহর, খোরপোষ এবং অন্যান্য আর্থিক পাওনা পরিশোধ করতে হতো। ফলে একতরফা তালাক আইনগতভাবে সম্ভব হলেও তা অর্থনৈতিকভাবে সহজ ছিল না। এর পাশাপাশি সামাজিক নৈতিকতা ও প্রচলিত নানা রক্ষাকবচও স্বামীর এই ক্ষমতাকে সীমার মধ্যে রাখত।

দ্বিতীয়ত, স্বামীর একতরফা তালাকের ফলে তার সম্পদের একটি অংশ স্ত্রীর কাছে চলে যেত। এই অর্থ ছিল বিয়ের সময় স্ত্রীকে দেওয়া সম্পদের অতিরিক্ত। এর বাস্তব প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অনেক তালাকপ্রাপ্ত নারী বিবাহবিচ্ছেদের পর পাওয়া অর্থ দিয়েই বৈবাহিক বাড়ি বা ভিটেমাটিতে স্বামীর অংশ কিনে নিতেন। অর্থাৎ, একতরফা তালাক শুধু বৈবাহিক সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটাত না; এর সঙ্গে স্বামী থেকে স্ত্রীর দিকে একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ হস্তান্তরও ঘটতে পারত।

তৃতীয়ত, খোলার মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ হলেও সাধারণত নারীর মোট সম্পদ খুব বেশি কমে যেত না। খোলার ক্ষেত্রে স্ত্রী সাধারণত তার বকেয়া দেনমোহর এবং ইদ্দতকালীন খোরপোষের দাবি ছেড়ে দিতেন। এর বাইরে তার নিজস্ব সম্পদ, উত্তরাধিকার বা আগে থেকে অর্জিত সম্পত্তির ওপর অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকত। এই প্রথা এতটাই প্রচলিত ছিল যে তৎকালীন আইনী গ্রন্থগুলোতেও একে স্বাভাবিক ও স্বীকৃত একটি ব্যবস্থা হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বিয়ের সময় স্বামী যে আর্থিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পরে সেই প্রতিশ্রুতিই খোলার সময় দরকষাকষির প্রধান উপাদানে পরিণত হতো।

‘খোলা’ ছিল স্ত্রীর উদ্যোগে বিবাহবিচ্ছেদের একটি স্বীকৃত ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে একজন নারী এমন বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পারতেন, যা তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। এই ব্যবস্থা নারীর ওপর পারিবারিক নির্যাতন এবং দাম্পত্য কলহের বাস্তবতা বোঝার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ।

তখন আদালতে যাওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। ফলে অসুখী বা নির্যাতিত স্ত্রী কাজীর কাছে অভিযোগ জানাতে পারতেন। কাজী অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার জন্য আদালতের কর্মকর্তাদের পাঠাতেন। তারা খোঁজ নিতেন, স্ত্রীর ওপর কী ধরনের নির্যাতন হয়েছে বা কোন পরিস্থিতি তার বৈবাহিক জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে। নির্যাতনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে আদালত বিবাহ ভেঙে দিতে পারত, এবং এমন সিদ্ধান্ত প্রায়ই দেওয়া হতো।

আইন নারীর আত্মরক্ষার অধিকারও স্বীকার করত। কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে এই আত্মরক্ষার অধিকার নারীকে এমন অধিকার দিত যে সে দরকার হলে অত্যাচারী স্বামীর বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে পারত৷ অর্থাৎ প্রতিরোধ করতে যেয়ে স্বামী নিহত হলেও স্ত্রী প্রতিরোধকারিনী হিসেবে দায়মুক্তি পেত।

তবে স্বামী নির্যাতনকারী না হলেও, স্ত্রী যদি দাম্পত্য জীবন আর চালিয়ে যেতে না চাইতেন, তাহলে খোলার মাধ্যমে বিবাহের সমাপ্তি ঘটানোর পথ তার জন্য খোলা ছিল। এ ধরনের দাম্পত্য বিরোধের শুধু আইনী দিক ছিল না; এর সামাজিক দিকও সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিয়ের পরেও নারীর সঙ্গে তার পৈতৃক পরিবারের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত না। মা-বাবা, ভাই-বোন এবং অন্যান্য নিকট আত্মীয় তার বৈবাহিক জীবনের খোঁজ রাখতেন। সাধারণত মা-বাবাই মেয়ের বিয়ের আয়োজন করতেন। তাই বিয়ের পর তার সুখ-শান্তির সঙ্গে তাদেরও একটি সামাজিক ও নৈতিক দায় জড়িয়ে থাকত।

বিয়ে ভেঙে গেলে বিষয়টি শুধু মেয়ের ব্যক্তিগত ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হতো না। পরিবারকেও সেই পরিণতির মুখোমুখি হতে হতো। অনেক ক্ষেত্রে মেয়েকে আবার পৈতৃক বাড়িতে ফিরিয়ে নিতে হতো, যার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা দায়িত্বও যুক্ত ছিল। মেয়ের সংসার যাতে টিকে থাকে এই চাওয়ার পিছনে তার পৈতৃক পরিবারেরও স্বার্থ সরাসরি জড়িত ছিল। তাই জামাইয়ের অন্যায় বা নির্যাতনের দিকে তারা সতর্ক নজর রাখতেন। কখনো এই হস্তক্ষেপ খুব সরাসরিও হতো। এমন ঘটনাও ঘটত যে নির্যাতনকারী স্বামীকে স্ত্রীর ভাইয়েরা শারীরিকভাবে প্রতিরোধ করত। ফলে প্রাক-আধুনিক ইসলামী সমাজের নারীকে দাম্পত্য সংকটে সব সময় একা লড়তে হতো না। তার পৈতৃক পরিবার মানসিক, সামাজিক এবং প্রয়োজন হলে অর্থনৈতিক সহায়তাও দিত।

এর অর্থ এই নয় যে পারিবারিক নির্যাতন ছিল না বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে শক্তিশালী পারিবারিক সহায়তার কারণে নির্যাতনের সুযোগ ও মাত্রা অনেক ক্ষেত্রে সীমিত হতো। সব ধরনের সমঝোতা ব্যর্থ হলে বিষয়টি আদালতে গড়াত। আবার কখনো আদালতের বাইরেই স্ত্রীর পরিবার, এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর পরিবারও, যৌথভাবে বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্তে পৌঁছাত। শেষে নারীদের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার।

কোনো কোনো মুসলিম শহরে জমি ও বাড়িঘরের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মানুষের প্রায় ৪০ শতাংশই ছিলেন নারী। তারা নিয়মিত আদালতে গিয়ে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের তথ্য নথিভুক্ত করতেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, নারীরা শুধু সম্পত্তির মালিকই ছিলেন না; বাড়ি, জমি ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি কেনাবেচা ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন। আদালতের নথি থেকে দেখা যায়, নারীরা আবাসিক ও বাণিজ্যিক—দুই ধরনের সম্পত্তিরই মালিক ছিলেন। বিশেষ করে ভাড়া দেওয়া দোকানপাটের মালিক হিসেবে নারীদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য ছিল। অনেক নারীর নিজস্ব বাড়িও ছিল।

আবার বিয়ের আগে বা বিয়ের সময় স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে বাড়ি কিনতেন। স্বামী একতরফাভাবে তালাক দিলে স্ত্রী অনেক সময় বিবাহবিচ্ছেদ থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে সেই বাড়িতে স্বামীর অংশ কিনে নিতেন। অর্থাৎ, বিবাহবিচ্ছেদের পরও একজন নারী সম্পত্তির ওপর নিজের অবস্থান আরও শক্ত করতে পারতেন। মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি ছিল ওয়াকফ। এই ক্ষেত্রেও নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের আগমনের সময় মুসলিম বিশ্বের মোট জমির প্রায় ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ কোনো না কোনোভাবে ওয়াকফের অধীনে ছিল।

সুলতান, রাজা, উজির ও আমিরদের প্রতিষ্ঠিত বিশাল ওয়াকফ বাদ দিলে, মাঝারি ও ছোট আকারের বহু ওয়াকফের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নারী। এ থেকে বোঝা যায়, ওয়াকফ অর্থনীতিতে নারীর উপস্থিতি প্রান্তিক ছিল না; বরং তারা এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন। নারীরা প্রায়ই নিজেরাই ওয়াকফ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতেন। আবার কখনো পুরুষ বা অন্য নারীদের সঙ্গে যৌথভাবেও

ওয়াকফ গড়ে তুলতেন।

রাজনৈতিক ও সামরিক অভিজাতদের সঙ্গে যুক্ত মুক্ত দাসীদের মধ্যেও ওয়াকফ প্রতিষ্ঠার নজির ছিল। তারা কখনো স্বাধীনভাবে, আবার কখনো সাবেক মনিবদের সঙ্গে যৌথভাবে ওয়াকফ প্রতিষ্ঠা করতেন। এটি প্রমাণ করে যে মুক্ত দাসীরাও অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সম্পদ, আর্থিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব অর্জন করতে পারতেন। সাধারণ ও মাঝারি আকারের ওয়াকফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান ছিল। ওয়াকফ অর্থনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ নতুন কোনো ঘটনা ছিল না। বহু শতাব্দী ধরে তাদের উপস্থিতি ক্রমাগত বেড়েছিল। অষ্টাদশ শতক নাগাদ মোট ওয়াকফ প্রতিষ্ঠাতার প্রায় ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ ছিলেন নারী। কোনো কোনো অঞ্চলে নারীদের প্রতিষ্ঠিত ওয়াকফের সংখ্যা পুরুষদের চেয়েও বেশি ছিল।

নারীদের প্রতিষ্ঠিত ওয়াকফ শুধু নিজেদের পরিবারকে সুবিধা দেওয়ার জন্য ছিল না। কোনো কোনো শহরে এসব ওয়াকফের বড় একটি অংশ—কখনো অর্ধেকেরও বেশি—ছিল জনকল্যাণমূলক। এসব ওয়াকফ ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক কাজ, দরিদ্রদের সাহায্য এবং খাবারের ব্যবস্থা করার মতো জনসেবামূলক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হতো। পুরুষদের মতো নারীরাও নিজেদের সম্পত্তি ব্যবহার করে এসব জনকল্যাণমূলক ওয়াকফ গড়ে তুলতেন। ওয়াকফ প্রতিষ্ঠাতা নারীর তুলনায় নারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা আরও বেশি ছিল—এমনটি ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত। পুরুষ ও নারী সুবিধাভোগীর সুনির্দিষ্ট অনুপাত এখনো পুরোপুরি নির্ধারণ করা যায়নি। তবে পাওয়া তথ্য থেকে বোঝা যায়, তাদের সংখ্যা মোটামুটি সমান ছিল।

একসময় ধারণা করা হতো, ওয়াকফ ব্যবস্থা নারীদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য ব্যবহার করা হতো। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণ এই ধারণাকে সমর্থন করে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে ওয়াকফের মাধ্যমে নারীর সম্পত্তিগত অধিকার ও অবস্থান আরও নিরাপদ ও স্থায়ী করা হতো। ওয়াকফ প্রতিষ্ঠার পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিক সম্পত্তিকে অতিরিক্তভাবে খণ্ডিত হওয়া থেকে রক্ষা করা।

কুরআনি উত্তরাধিকার বিধি অনুযায়ী একটি সম্পত্তি বহু উত্তরাধিকারীর মধ্যে ভাগ হয়ে যেতে পারে। ফলে সময়ের সঙ্গে জমি বা অন্য সম্পত্তি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতো।

এতে কখনো সম্পত্তির অর্থনৈতিক মূল্য ও ব্যবহারিক কার্যকারিতা কমে যেতে পারত। ওয়াকফের মাধ্যমে সম্পত্তির মূল কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হতো, আর তার আয় বা সুবিধা বিভিন্ন উত্তরাধিকারীর মধ্যে ভাগ করা যেত। তাই অনেক ওয়াকফনামায় দেখা যায়, সুবিধাভোগীদের অংশ নির্ধারণেও কুরআনি উত্তরাধিকার বিধির অনুপাত অনুসরণ করা হয়েছে।

অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের আলেপ্পোর ৪৬৮টি ওয়াকফনামা নিয়ে এক ইতিহাসবিদের গবেষণায় দেখা যায়, এক শতাংশেরও কম ক্ষেত্রে নারী উত্তরাধিকারীরা বঞ্চিত হয়েছেন। নারী ওয়াকফ প্রতিষ্ঠাতারা সাধারণত পুরুষদের তুলনায় নারী আত্মীয়দের বেশি সুবিধাভোগী করতেন।

অন্যদিকে প্রায় ৮৫ শতাংশ পুরুষ তাদের স্ত্রী, কন্যা অথবা উভয়কেই ওয়াকফের সুবিধাভোগী হিসেবে মনোনীত করতেন। ষোড়শ শতকের ইস্তাম্বুলের নথিতেও প্রায় একই ধরনের চিত্র পাওয়া যায়। পারিবারিক ওয়াকফের বাড়িতে বসবাসের অধিকারেও একই

প্রবণতা দেখা যায়। আলেপ্পো, ইস্তাম্বুল এবং অন্যান্য অঞ্চলের অধিকাংশ ওয়াকফনামায় নারীদের বসবাসের অধিকারে কোনো স্পষ্ট বৈষম্য বা কঠোর সীমাবদ্ধতা ছিল না। যেখানে কিছু শর্ত ছিল, সেখানেও সাধারণত নারী বিয়ের আগ পর্যন্ত সেই বাড়িতে থাকতে পারতেন। অনাথ বা তালাকপ্রাপ্ত হলে আবার সেখানে ফিরে আসার অধিকারও থাকত।

এই সুবিধা শুধু প্রথম প্রজন্মের নারীদের জন্য ছিল না। পরবর্তী প্রজন্মের নারীরাও অনেক ক্ষেত্রে একই অধিকার পেতেন। ফলে বিবাহিত নারী, তার স্বামী এবং সন্তানরাও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সেই পারিবারিক বাড়িতে থাকার অধিকার দাবি করতে পারতেন। ওয়াকফ পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও নারীদের যোগ্য বলে মনে করা হতো। এই দায়িত্বে পুরুষের সংখ্যা বেশি হলেও বহু নারী তাদের বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী কিংবা অন্যান্য আত্মীয়ের প্রতিষ্ঠিত ওয়াকফ পরিচালনা করতেন।

কিছু ক্ষেত্রে আদালত অপ্রাপ্তবয়স্ক বা কমবয়সী পুরুষের পরিবর্তে প্রাপ্তবয়স্ক নারীকে ওয়াকফ পরিচালনার জন্য অগ্রাধিকার দিত। নারীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত ওয়াকফের প্রথম পরিচালক হিসেবেও নিজেদের নিয়োগ করতে পারতেন। আর ওয়াকফের অধিকার ক্ষুণ্ন হলে তারা নিজেদের পক্ষে বা অন্য সুবিধাভোগীদের পক্ষে আদালতে মামলা করতে পারতেন। অর্থাৎ, নারীরা ওয়াকফে শুধু সম্পত্তিদাতা বা সুবিধাভোগী ছিলেন না; তারা এর প্রশাসক এবং আইনী রক্ষকও হতে পারতেন।

সংক্ষেপে বলা যায়, মুসলিম নারীরা আইনী ব্যবস্থার পূর্ণ ও সক্রিয় অংশীদার ছিলেন। উসমানীয় নারীদের বিষয়ে একজন ইতিহাসবিদ দেখিয়েছেন, তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নিয়মিত আদালতের আশ্রয় নিতেন।

একজন মুক্ত দাসী তার সম্পত্তির ওপর সাবেক মনিবের অন্যায় দাবি প্রতিহত করতে পারতেন। একজন কৃষিজীবী নারী নিজের কেনা মূল্যবান গবাদিপশুর ওপর পাওনাদারের দাবি চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন।

একজন বিধবা তার স্বামীর যৌথ সম্পত্তির অংশ কিনে নেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দাবি করতে পারতেন। এমনকি একা ভ্রমণরত কোনো গ্রামীণ নারী তার পথ আটকানোর অভিযোগে পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও আদালতে যেতে পারতেন। এসব উদাহরণ দেখায়, আদালত নারীদের জন্য কেবল তাত্ত্বিকভাবে উন্মুক্ত ছিল না; তারা বাস্তবেও এই অধিকার ব্যবহার করতেন। আদালতের কার্যকারিতা যদি সামাজিক নৈতিকতার ওপর নির্ভর করে থাকে, তবে সেই নৈতিকতার ক্ষেত্রেও নারীরা পুরুষদের মতো পূর্ণ অংশীদার ছিলেন।

আইন ও আদালত যে সততা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও নৈতিক চরিত্র দাবি করত, নারীরাও সেই গুণের অধিকারী হিসেবে স্বীকৃত হতে পারতেন। এই নৈতিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়েই তারা আইনী প্রক্রিয়ায় অংশ নিতেন। তারা সব সময় জয়ী হতেন না। কখনো হেরেছেন, কখনো জিতেছেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তারা আইনী ব্যবস্থার বাইরে থাকা কোনো নিষ্ক্রিয় গোষ্ঠী ছিলেন না।

আইনী ব্যবস্থার সক্রিয় অংশীদার হিসেবে নারীরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী কৌশল তৈরি করতেন। তারা আইন, সামাজিক সম্পর্ক, পারিবারিক সহায়তা এবং নৈতিক মর্যাদা—সবকিছুকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যবহার করতেন। তারা নিঃসন্দেহে একটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বাস করতেন। কিন্তু এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে একমাত্রিকভাবে বোঝা যাবে না। এর ভেতরের সামাজিক ও আইনী সম্পর্কগুলো নারীদের এমন কিছু বাস্তব ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিয়েছিল, যার মাধ্যমে তারা সম্পত্তি পরিচালনা, আদালতে

মামলা, বিবাহবিচ্ছেদ এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজেদের উদ্যোগে কাজ করতে পারতেন। আধুনিক যুগে গড়ে ওঠা কিছু ‘ইসলামী আধুনিকতা’ নারীদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে নিপীড়নমূলক হয়েছে। কিন্তু সেই আধুনিক অভিজ্ঞতাকে অতীতের ওপর সরাসরি বসিয়ে দিলে প্রাক-আধুনিক মুসলিম নারীদের বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করা হবে।

আধুনিকতার আগের দীর্ঘ এক হাজার বছরে মুসলিম নারীরা এমন বহু সামাজিক, সম্পত্তিগত ও আইনী অধিকার ভোগ করতেন, যা একই সময় বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে, বিশেষ করে ইউরোপে নারীদের জন্য ছিল না বললেই চলে।

---

[1] *নোট: এ বিষয়ে আমাদেরকে একটু গভীরে যেতে হবে। জীবনের সকল কেষত্রের নারীরা পুরুষদের অর্ধেক এমন ভাবনা যেন না আসে সেজন্য স্বাকেস্যর এ বিষয়টি কিভাবে আসলো, এর প্রয়োগ কোথায়, কিভাবে ইৎযাদি নিয়ে আহলুস সুন্নাহর উলামা-মাশায়েখ কি বলেছেন তার দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। সূরা বাকারার ১৮২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, আর তোমাদের পুরুষদের মধয থেকে দুজনকে সাকষী রাখবে। যদি দুজন পুরুষ পাওয়া না যায়, তবে তোমাদের পছন্দের সাকষীদের মধয থেকে একজন পুরুষ ও দুজন নারীকে সাকষী রাখবে—যাতে নারী দুজনের একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। এই আয়াত উল্লেখ করে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রাহি.) বলেছেন,*

“এই আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, একজন পুরুষের পরিবর্তে দুজন নারীকে সাকষী রাখার উদ্দেশয হলো—তাদের একজন ভুল করলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। আর এমন বযবস্থা সেসব কেষত্রেরই প্রয়োজন হয়, যেখানে সাধারণত ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে; র্অথাৎ ভুলে যাওয়া এবং বিষয়টি যথাযথভাবে স্মরণ ও সংরকষণ করতে না পারা।”

শায়খ ইবনুল কাইয়িম (রাহি.) তার উস্তাদের উপরের উদ্ধৃতি উল্লেখ করার পর বলছেন, “ন্যায়পরায়ণ নারী সৎযবাদিতা, আমানতদারি ও দ্বীনদারির কেষত্রে পুরুষের মতোই। তবে তার কেষত্রে ভুল ও বিস্মৃতির আশঙ্কা থাকায় আরেকজন নারীর মাধযমে তার সাকস্যকে শকিতশালী করা হয়েছে। আর এই সম্মিলিত সাকস্য কখনো একজন পুরুষের সাকেস্যর চেয়ে শকিতশালী অথবা তার সমর্পযায়েরও হতে পারে।”

এরপর তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, “এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উম্মুদ দারদা ও উম্মু আতিয়যার মতো নারীর সাকস্য থেকে যে নিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়, তা তাঁদের চেয়ে নিম্নমানের কোনো একজন পুরুষের সাকস্য থেকে সৃষ্ট নিশ্চয়তার চেয়ে শকিতশালী।”

তিনি আরও বলেন, “আর যেসব কেষত্রে নারীদের নিজদের বযাপার থাকে যেমন তাদের র্গভধারণ, ঋতু ইৎযাদিতে তাদের স্বাকস্য পুরুষের সমান।” (ইবনুল কাইয়িম, আত-তুরুকুল হুকমিয়যাহ ফিস-সিয়াসাতিশ শারইয়যাহ)

এই আলোচনা থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হয় যে ইসলামে সার্বিক দিক থেকে নারীরা পুরুষের র্অধেক বা নিম্নতর নয়।

নারীরা যেহেতু বাহিরের সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা যেমন আর্থিক লেনদেন, চুকিত ইৎযাদির সাথে সম্পৃকত থাকে কম, এসব নিয়ে তাদের মাথা ঘামাতে হয় কম, তাই এসব ব্যাপারে তাদের ভূলে যাওয়ার আশঙ্কাও বেশি। তাই কেউ যেন তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য যেখানে ভূলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি সেখানে আল্লাহ একটা নিরাপৎতা ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন। বাকি দ্বীনদারিতা, দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিদান ইৎযাদির ক্ষেৎরে তারা পুরুষদের থেকে কোন ভাবেই কম না। এসব ক্ষেৎরে তাদের ও পুরুষদের জন্য আল্লাহর দেওয়া র্সাবজনীন নীতি প্রযোজ্য হবে র্অথাৎ তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক সম্মানিত, যে অধিক পরহেজগার। (সুরা হুজুরাত: ১৩)